আমি পাইনে তোমারে

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

সত্যি বলুন তো সূর্যকে কি ঠিক ভালোবাসা যায় ? শিশুর কাছে সূর্য সূয্যিমামা। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া মানুষের কাছে আদরের সুর্যাই। কিন্তু আমার কাছে সূর্য মহামহিম, মহামান্য। ওঁকে অস্বীকার করার কোন জায়গাই নেই। আমার অস্তিত্বই নির্ভর করছে তাঁর ওপর। কিন্তু কেউ যদি বলে, চল, সূর্য তোমাকে ডাকছেন, আমার প্রথম প্রতিত্রিয়াই হবে---না, তাঁর কাছে গিয়ে পুড়ে মরবার ইচ্ছে নেই। তাঁর থেকে ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দুরে আছি। তাঁর আলো অনেক স্তর পেরিয়ে আট মিনিটেরও বেশি সময় কাটিয়ে আমার ক াছে আসুক। আমি তাতেই খুশি।

আমার ভাব-ভালোবাসা তাঁর আলোয় সবুজ হওয়া গাছের পাতার সঙ্গে, ঘাসের সঙ্গে । তাঁকে দেখব মেঘরৌদ্রের খেলায়। দেখব তঁ াকে আকাশজোড়া মেঘের আলোয়। যাঁকে ছোঁয়া যায় না, তিনিই সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা ছোঁওয়া যায়। যাঁর দিকে তাকানো যায় ন া, তাঁরই সৃষ্টি এমন কিছু যার দিকে নির্নিমেষে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকা যায়। আমি সূর্যের কাছে যেতে পারি না, যেতে চাইওনা। কিন্তু সূর্য না থাকলে যাদের পেতাম না, সেই গাছপালা, মানুষ আর পৃথিবীজোড়া প্রাণের ঐর্যকে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করতে চাই। আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে চাই না (সম্ভব তো নয়ই, যদি সম্ভব হত তাহলেও না) কিন্তু যেতে চাই তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের কাছে, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গানের কাছে, রবীন্দ্রনাথের গান অনেকেরই মতো, আমার কাছেও এক নিবিড় আশ্রয়। কি করে যে মানুষের মনের ছোট ছোট কাঁপন, মর্মরধবনি থেকে শু করে হাহাকার, আনন্দ আর অভ্যুত্থানের উথালপাথাল ঢেউ সবই ধরা পড়ে যায় তাঁর গ ানে ! মনে হয় এই কাঁপন এই ঢেউ তো আমার, একান্তভাবে আমার মধ্যেই উঠেছিল। কী করে তার খোঁজ পেলেন তিনি, আর প্রকাশ করলেন ঠিক আমি যেভাবে বলতে চাই কিন্তু বলতে পারি না, সেভাবে ? মাঝে মাঝে একটু অভিমানও হয়। এমন করে সব কথা গানে বলে দিলে আমরা বলব কী ? এই অস্মিতাবোধ, মন্ময়তাই রবীন্দ্রনাথের গানকে শুধু আমার আপন নয়, সবার আপন করে নিয়েছে।

যেহেতু গানের মধ্যে মন্ময়তার কথা বলছি, যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অনুভুতির যোগ, তাই একটু সাহস হচ্ছে। অন্য কারও অনুভবের সঙ্গে তা না মিলতেই পারে। কখনও কোন গানের সবটাই মনে হয় আমার মনের কথা। কখনওবা কোন গানের দু-একটি ল াইন নিজের কথা মনে হয়, তার পরের কথাগুলি আর নিজের মনে হয় না। একই গানের কিছু অংশ আমার অন্তর থেকে যাচ্ছে বাইরে, আবার কিছু অংশ বাইরে থেকে আসছে ভেতরে। ঠিক বোঝাতে পারিনি বোধহয়। সম্পূর্ণ গানটির সঙ্গে অনুভবের একাত্মতার উদ াহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমন গান অনেকেই আছে। আংশিক মন্ময়তার একটি উদাহরণ দিই। এমন এক একটা সময় আসে মনট া কেমন ভারী লাগে। শোকে পাথর হইনি, বিষাদের কোনও প্রত্যক্ষ কারণও চিহ্নিত করতে পারছি না। মন খারাপ করাও নয়, এমন এক অনুভুতি । একটা ভারী কিছু চেপে বসে আছে, তাকে সরাতে পারছি কী সরাতে পারছি না, তাও বুঝতে পারছি না। আসলে এ মনের উপর কোন চাপিয়ে দেওয়া ভার নয়, মন নিজেই ভারী চাপ দিচ্ছে আমার সত্তায়। তাই তার স্ফুর্তি নেই, বিহ্বলতাও নেই। তখন যদি শুনি ‘ আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার’,। যায় না-যায় না’ এই পুনক্তির মধ্যে দুটি দিকফুটে ওঠে। ‘যায় না, যায় না’ গাওয়ার সময় এমন একটা ভাব আসে যে, কী যে যায় না তাই স্পষ্ট হচ্ছে না। তারপর যখন গাওয়া শু হল ‘যায় না মনের ভার’ তখন ভাবনার বৃত্তটি শেষ হল এক অবর্ণনীয় অনুভূতির ইঙ্গিত। এ পর্যন্ত গানটি সম্পূণর্ই আমার কোন বিশেষ মূহূর্তকে কি আশর্চ্য অনায়াস ভঙ্গিমায় প্রকাশ করল। তারপরের লাইনে দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার। এ পর্যন্তও চলে আগের ভাবের অনুসৃতি। আমার সত্তা হঠাৎ যেন আকাশসম হয়ে উঠল। আমার সত্তায় মনের ভার, আকাশে মেঘের ভার। মেঘের ভারের একটি দর্শন গ্রাহ্য (না কি অদর্শনগ্রাহ্য) রূপ অন্ধকার । দিনের আকাশ অন্ধকার হচ্ছে। যা সাধারণ নয়, প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু তারপর যখন গানে শুনি ‘মনে ছিল, আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায়নি খুঁজি?’ তখন মনে হল, না, আমার ছবিটা তো এরকম নয়। আমার মনেরভার যদি না গিয়ে থাকে সেটা কারও আসার ব্যর্থ প্রত্যাশায় নয়। এখানে তো কারণটা চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। ওই দু লাইন পযন্ত গানটা ছিল আমার। আমার কথাই বলা হচ্ছিল গানে, ত ারপর থেকে শুনছি অন্যের কথা। আগেই বলেছি--এটা হচ্ছে আমার, একান্তই আমার ব্যক্তিগত অনুভব । অন্য কারো কাছে পুরো গ ানটিই তার সত্তার কোন বিশেষ সময়ের ছবি আঁকতে পারে। গীতবিতানে এটি ‘বর্ষা’ চিহ্নিত গান। সে দিক থেকে ‘দিনের আকাশ মেঘে

অন্ধকার' কে অবশ্যই বর্ষার রূপ ধরে নেওয়া যায় ।এই রকম আর কি।

আচ্ছা ধরা যাক, আমি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারি। আমি যখন এই গানটি গাইব তখন আমার গায়নের মধ্যে এই যে, নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলা, আর তারপরে অন্যের কথাকে নিজের মতো করে বলা দোলাচলটা ফুটে উঠবে না ? প্রথম দু'লাইন অভিনয় নয়, তারপর থেকেই অভিনয়, তাই হচ্ছে নাকি, গানে এক্ষেত্রে ? অন্তত আমার কাছে ?
---অতো নিজের মতো করতে যাবেন না। যা করবেন নিজের গানে কন। গানের মধ্যে কখনও অভিনয় নয়, কখনও অভিনয়, এসব আব ার কি? অভিনয় অন্য একটি মাধ্যম, তাকে গানে মেশাতে যাওয়া মানে গানকে পথভ্রষ্ট করা।
বুঝলাম, কিন্তু গানটি যখন অন্তর দিয়ে গাওয়া হবে, তখন তো নিশ্চয়ই সে ভাবটি শুধু তাঁর কণ্ঠে নয়, তাঁর সারা অস্তিত্বে ফুটে উঠবে। মুখে চোখে তো তার ছাপ পড়বেই। ---না, গানের মধ্যে ওই ধরনের আবেগকে প্রশ্রয় দিলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

---খুব সত্যি। কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'লে তো সেটা বোঝা যাবে, চিনে নেওয়া যাবে, বোঝা যাবে যে এটা বর্জনীয়; কিন্তু গান কি শুধুই কথা, শুধুই সুর, শুধুই কণ্ঠকৃতি ? তার মধ্যে প্রাণ তো থাকবে। আর প্রাণের প্রকাশ কি শুধু Perfection এ, তার নির্ভুলতায় ? তাই যদি হয় তবে কিসের Perfection? গানটি কে কতখানি স্বরলিপিঅনুগ
গাইলেন, তাই দেখব ? না গানটির অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে কে কতখানি সঞ্চারিত করতে পারলেন শ্রোতাদের,মনে তাই দেখবে ?
----দেখুন আপনি Performer দের কথা বলেছেন । রবীন্দ্রসংগীত Performer দের জন্য নয়,Artiste-দের জন্য।
--- Performer -রা তো Artiste নন, আপনার মতে। তবে কি Perform না করতে পারা Artisteদের একটি বিশেষ লক্ষণ Performer? আমি তো রবীন্দ্রনাথের গানের বড় শিল্পী সুচিত্রা, কণিকা, দেবব্রত, সুবিনয় সববাইকে খুব বড় Performer বলে মনে করি। এবং প্রত্যেকের Performance গানের বাইরে তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুসমঞ্জস। এঁদের মধ্যে কেউ একই সঙ্গে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী, কেউ বা শুধু অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের গানের চয়নও হয় তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাল রেখে। 'ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে' শ্রোতাদের কাছে যাঁদের কৃতিত্বে, সেসব শিল্পীদের Performer বলব না ?

----আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন। ---তাই কি? আমি একবার এক শ্রমিক সমাবেশে 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, হবেই হবে' গানটি গেয়েছিলাম (ভয় নেই, একজন প্রশিক্ষিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর কাছে যথাসাধ্য শিখে এবং গানটি যে গাইতে পারছি, সেই অভয়বানী নিয়ে।' নিজের চোখে দেখেছি কী আশর্চ্য উজ্জ্বলতা। সংগ্রামরত শ্রমিকদের চোখে । যখন গাইছিলাম 'ঘন্টা উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে / এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে / ওরে মন হবেই হবে', তখন উদ্দীপনার আর সজীবতার সঞ্চার করতে পেরে আমারও আনন্দ হচ্ছিল। এটাও এক পূর্ণতা অর্থাৎ Perfection । কিন্তু এটা শুধু স্বরলিপি অনুগমন থেকে আসেনি, এসেছে গানের ভাবের সঙ্গে একাত্মতায়, প্রাণের স্ফুর্তিতে, নিবেদনের আনন্দে।
---এটাতো মানবেন, রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপি অনুসরণের কোন বিকল্প নেই ?
---একশোবার মানব। স্বরলিপি থেকে এবং প্রথিতযশা শিল্পীদের সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছে বা অন্য কোন গুণিজনের কাছে শেখা গ ায়নের মধ্যে পার্থক্যজনিত বাদ - বিবাদের কথা মনে রেখেও মানব। কিন্তু গানের ভাবের সঙ্গে একাত্মতার বোধ সঞ্চারেরও কোন বিকল্প নেই, এটাও তো মানবেন । যখন পরিষ্কার বোঝা যায় গানের কথা গায়কের নিজের মনের কথা নয়, সুরটা গায়কের নিজের মনের কথা নয়, সুরটা তাঁর তোলা আছে, সামনে বইও খোলা আছে, তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে গানটি গেয়ে গেলেন ---তা শুনে আমার গ ানটি ভাল লাগতেই হবে, এমন কথা নেই।
কার সঙ্গে কথা বলছি ? বোধহয় নিজের সঙ্গেই। প্রকাশ্যে কথা বলবার মতো গানের চর্চা তা রবীন্দ্রচর্চা বা রবীন্দ্রসংগীতচর্চা, তো করিনি।

কেউ তো দেখছে না, কখনও কখনও খেলার ছলে সুরের বিচার করতে বসি। ভাবুন, রবীন্দ্রনাথের সুরের বিচার ! মনে আছে কিশোর বয়সে ছোট বোনকে পাশে রেখে আমি প্রকৃতির দৃশ্যের বিচার করতে বসতাম। বোন কী বুঝত কে জানে ? 'আজকে দেখ, আকাশটা আঁ াকলে ড্রইং স্যার বেশি নম্বর দিতেন না। কেন এখানে -ওখানে একটু সাদা মেঘ থাকলে ভাল হত না? ঘন্টা খানেক পরেই দেখি---আরে বেশ কিছু সাদা মেঘ ভাসছে সেখানে। বোনকে বলতাম, 'দেখছিস আমার কথা শুনেছে।' বোন অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। সেইরকম আর কি। এক একটা গান দেখি গীতবিতানে আর সুরটা মনে করার চেষ্টা করি। সবটা তো মনে পড়ে না। হয় সবটা, নয় কিছুটা মনে পড়ে, অ ার মনে মনে বলি, কি সুন্দর। কখনও বা তা উঁহু এখানটা যেন কেমন লাগছে, এখানে সুর না ছোঁয়া কথাই বেশি করে বাজছে। একটা গ ানের সুর নিয়ে, ওই আকাশ বিচারের মতোই হয়তো, একসময় মনে মনে বলেছিলাম--এ গানের সুরে বড় বেশি সাজগোজ । গানটা

শুনলেই তালে তালে আঙুল চঞ্চল হয়ে ওঠে, গানের কথার সঙ্গে যাচ্ছে না সুর। গানটি হচ্ছে --
প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা।
এখন মনে হয়, 'মিথ্যা এ সজ্জা' কি ইচ্ছে করেই গানেও পরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ? গানটি বিলম্বিত লয়ে গাইলে ওইঅনুযোগের তীব্রতা তো ফুটছে না ! 'ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস তব মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী / এই দ্বন্দ্ব, এই বিরোধিতাই মনেহয়, ফুটে উঠছে কথা ও সুরের অভিপ্রেত দ্বন্দ্বে। মনে হ'ল গানটা আগে বুঝিনি। এ চিন্তাটাও কাজে লাগাতে হবে সুর দেবার সময়।

কখনও বা দেখেছি গায়কদের গায়নেই গানের ছবি বদলে যায়। সেই 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' গানটিতে যেখানে আছে 'হায় পথবাসী হায় গতিহীন হায় গৃহহারা' সেই গৃহ হা-রার হা ও রা ধ্বনিতে সুরের ওঠানামা যথেষ্ট গায়নকুশলতা দাবি করে। অনেক গায়ক গা য়িকা একটু দ্রুতলয়ে গানটি পেয়ে তাঁদের কুশলতা দেখান। তখন এই অংশটি শাস্ত্রীয় সংগীতের কণ্ঠকৃতির কথা মনে করার । মনে হয়, গৃহহারাদের নিয়ে এমন ওস্তাদি কেন? অথচ একটু ধীরে অনায়াস ভঙ্গিতে গাইলে ওই গানের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস কানে আসে।

কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমার চিন্তাকে কত সহজে জুড়ে দিই। আজকে যখন দেশের সম্পদ সংস্কৃতি লুট হতে চলেছে, তখন মনে হয় না, একজন জননায়কের খুব প্রয়োজন ছিল, যাঁর সঙ্গে দেশের ব্যাপ্ত মানুষের অন্তরের যোগ ? সেই সংযোগে যিনি ঋদ্ধ, তাঁর কথা শুনে আমরা বেরিয়ে আসব আমাদের খাঁচা থেকে। ভাবতে ভাবতে গেয়ে উঠি---
বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
... ...
আমি যে কথা তাঁর মতো বলতে পারছিনা । তাই তো---
'কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান'.....
'তুমি না কহিলে কেমনে কব
প্রবল অজেয় বাণী তব...
আমার নিজের বলতে যে কিছু নেই, কবে আসবেন তিনি ?
'তাবে নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।'

কেউ বলবেন হয়তো, এটি তো ব্রহ্মসংগীত, সেই পরম কণাময় পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্রর উদ্দেশে । আমি বলি--না, আমি গাই এটি লেনিন, মাও, হো -চি মিনের মতো জননেতাদের উদ্দেশে । সৃষ্টি কাকে অশ্রুসিক্ত করে, কাকে প্রদীপ্ত করে স্রষ্টা কি সব জানেন ? কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমার অদ্ভুত ভালোবাসা - ভয়ের সম্পর্ক। যখন খোলা গলায় তাঁর গান গেয়ে উঠি, তখন আনন্দের সঙ্গেমিশে থাকে ভয়। রবীন্দ্রনাথ শুনছেন না তো। যদি শুনতে পেতেন আমি ঠিক স্বরগুলি ছুঁচ্ছি না, ভাবও ঠিক ফোটাতে পারছি না--- কতো দুঃখ পেতেন । নগণ্য মানুষ হয়েই আমি আমার গানে বা আমার সুরারোপিত গানের অন্যমনস্ক নিবেদনে দুঃখ পাই , তিনি যে প াবেন, তা তো অবধারিত। কথা সুর নিয়ে তাঁর গান এক একটি Composition,পাশ্চাত্যসংগীতের মতো। সুর সম্পূর্ণ ঠিক রেখে ভাষ ান্তরেও যে গান ব্যাহত হয়, শ্রদ্ধেয় শোভন সোমের লেখায় পড়েছি। এ গানে একই সঙ্গে শৃঙ্খলমোচন আর কঠোর শৃঙ্খলার যুগলবন্দি। না শিখে আপন মনে গাওয়া যায়, কাউকে শোনাতে যাওয়া কি ঠিক ? শিখলে ও কি ভয় কাটত ? কে জানে! আপনি দূরে থাকুন রবীন্দ্রনাথ। আমি আপনার গান গাইব। আমার প্রাণের কথা, মনের কথা সব উজাড় করে দিলেন কেন গানে? ও গান কি আর নতুন করে লেখা যায় ? আর কেমন করে বলব---
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা, আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা, সব দিতে হবে।'
আপনি যে -প্রভুকে বলেছেন বলুন। আমার প্রভু আমার ঈশ্বর, সমূহিত সমন্বিত জনশক্তি। শেষ পর্যন্ত যাঁরা ইতিহাসের চালক -শক্তি। যাঁ রাই পারেন পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করতে । আমি তাঁদেরই তো বলব--
'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী --- সব দিতে হবে।'

সেই অমোঘ সর্বত্যাগের দিনের কথা, এত সহজে বলার ক্ষমতা কার আছে ! তাই তোমার (ভুল হল, তুমি এসে গেল কথায়) আপনার গানই গাই। ভুল থাকে নিশ্চয়ই তাতে, তবুও। আর একটা ছবি মনে আসছে। ধরা যাক আপনার গান ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের মুখে মুখে। চোখ রাঙাবারও কেউ নেই। গ্রামের ঝুমরিয়া বলছে, কার গান হে ? ---রবি ঠাকুরের গান। ---রবি ঠাকুর, আহা, বড় ভাল গ

ান বেঁধেছে বটে। বলে গাইতে লাগল গানের দু'কলি, হয়তো সুর ঠিকই আছে মোটামুটি ; কিন্তু তার গাইবার ঢং অন্যরকম, স্থানীয় উচ্চারণ তো এসে পড়বেই সে গানে। হেমাঙ্গদার গলায় যেমন 'স দেশের কমরেড লেনিন' গানে 'কোমরেড' উচ্চারণ কেমন ভালোবাসার ছোঁয়া নিয়ে আসত। তাই বলে আমি কি 'কোমরেড' গাইব? তা নয়, আমার গলায় তো সেটি কৃত্রিম, আরোপিত শোনাবে। অথরা ধরা যাক, ইস্কুলের ছোট্ট সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনে গান গাইছে ---

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি। এর মধ্যে মিশে যাচ্ছে একটু সাঁওতালি ছন্দ, কে আবার একটা মাদল নিয়ে এসে বাজাতে লাগল। সবাই মিলে আপনার গান গাইছে। ভুল গাইছে। ভুল। গাছের ডালে নানা আঁকিবুকির মতো ভাল। মাঠের মধ্যে এলোমেলো এই 'ভুলের' সাধনাই করলেন সারাজীবন---আপনার কাজে, আপনার কবিতায়, গানে, নাটকে আর অবশ্যই ছবিতে। কত মানুষের 'ভুল! ভুল!' ধবনি শুনে আপনি ফিরে তাকাননি। আপনার নাটকের গান নাটক থেকে বার করে নিয়ে এসে মাঝে মাঝেই গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে---

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।

আপনাকে ভালোবাসার সাধ্য নেই রবীন্দ্রনাথ ; কিন্তু আমি যে আপনার গানকে ভালোবাসি। আপনমনে আপনার গান গাই-- যতটা সম্ভব গুণিজনের গলায় যেমন শুনছি তেমন করে--তবু ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু আমাকে
আমার গান গাইতেই হবে। আমার গানে, আমার সুরে যে প্রাণ আসবে না, আপনার গান না গাইলে ! আপনার সুরের ধারায় আপনার গানে আমি স্নান করছি---আপনি রয়েছেন অনেক দূরে।

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুর গুলি পায় চরণ,
।

প্রথম প্রকাশ ঃ সূর্যবর্ত